চতুর্থ অধ্যায়

গল্পকারের 'কথা' ভুবন : লোকায়ত কথা যাত্রার বিনির্মাণ

রণবীর পুরকায়স্থের 'বোকা কাশীরাম কথা' গল্প সংকলনের গল্পক্রমকে তিনটি পর্বে বিন্যাস করেছেন। তৃতীয় পর্বের গল্পটি হলো 'মতামানুষ কথা'। এই গল্পে রঙ্গীকে নিয়ে ভাবে তার মামারা যে সে দুঃখে আছে। তার দুঃখ কাটানোর জন্য গৌহাটিতে নিয়ে যায়। প্রথমে রঙ্গী গৌহাটি যেতে রাজি ছিল না। তার পিতা শ্যাম সাহেব ও মামারা রঙ্গীর মানসিক অবস্থা বোঝার শক্তি নেই। তাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে যায়। তাই রঙ্গী শ্যাম সাহেবের মেয়ে হয়েও পিতার মৃত্যু কামনা করে। বিনন্দকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে তাই বিনন্দের ডাকে সাড়া দেয়। তার চোখে বিনন্দ অন্যদের থেকে আলাদা ব্যক্তি। রঙ্গীকে পুতুলের সঙ্গে তুলনা করে বিক্রম, ভিকি তাকে দুলালী বলে বিদ্রুপ করে, আর ঊষা আন্টি তার সরলতাকে ছেলে মানসি ভাবে। মামারা তাকে লোভ দেখায়, সম্পত্তি দেখিয়ে স্নেহ দিতে চায়। রঙ্গীর তখন যৌবন বয়স অবশ্য তার এইসব বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বিনন্দের কাছে রঙ্গীও খুব সুন্দরী। তার দৃষ্টিতে রঙ্গীকে অসমীয়া মেয়ের মতো লাগে। বিনন্দের মনে নতুন রং লেগেছিল। বিনন্দ রঙ্গীর বডিগার্ড ঠিক হল তা রঙ্গী জানত না। রঙ্গী বিনন্দকে বলে আসামের মানুষরা ভালো। রঙ্গী তাকে অন্তর থেকেই ভালোবেসেছিল। বিনন্দ উৎফুল্ল হয়ে আসামের বৈচিত্র তুলে ধরেন নানা চিত্রের মাধ্যমে। আসামে সমুদ্র নেই, সব সময় পরিষ্কার নীল আকাশ আর আছে বিশাল বড় লুইত নদী। আর এই লুইত নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে মানুষের মনের তুলনা করেছেন। এই সুন্দর চিত্র তুলে ধরতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে

করেন। নিজের আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। একদিন রঙ্গীর জ্বর আসল কাঁপতে কাঁপতে কিন্তু মতামানুষ বিনন্দ তাকে দেখতে আসেনি। অথচ সেই ছিল রঙ্গীর বডিগার্ড। তার ছোটো মামা অন্ধ্র-গুজরাট থেকে বাণিজ্য শেষ করে ফিরে এসে অসুস্থ রঙ্গীকে ডেলিভারি দিয়ে গেলেন ঊষা আন্টির কাছে। পিতা শ্যামসাহেব ভয় পাচ্ছিলেন ঊষা আন্টিকে কারণ রঙ্গীর শৈশব থেকেই ঘিরে আছে ঊষারানি। তার ছেলে ভিকিকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেও রঙ্গীকে স্নেহ করতো। রঙ্গী তার পিতাকে কবি, স্মার্ট দেখতে চান। তার পিতা পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে এবং রাত্রে মদ পান করে। রঙ্গী এসব পছন্দ করতো না। সে জানে মদ্য পান সামাজিক অপরাধ এবং নিজের বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে।

তাই সাহিত্যে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়— ''মতামানুষ কথায় এই প্রবনতাই সম্প্রসারিত হয়ে বাস্তবের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। রঙ্গী, শ্যাম সাহেব, ভিকি, বিনন্দ, নয়না, ঊষারানী এরা কেউই যেন পুরোপুরি বাস্তবের নয়, ইন্দ্রজালেরও। এমন কী, যে সমস্ত অনুপুঙ্খ বা বিবৃতি ঘটে, সমতার সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে— সেইসব আসলে ঘটেছে কিনা— এই প্রশ্নও জাগে মনে। গল্পকার খুব কৌশল সম্ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যবর্তী সীমারেখা মুছে দিয়েছেন। তাঁর প্রকৃত অন্বিষ্ট অর্ন্তবয়নের বিপুল ঐশ্বর্য্য।''[১]

লেখকের 'কাত্যায়নী কথা' গল্পের কথক চরিত্রটি কেরানির চাকরী করেন। সে মাঝে মাঝে কলকাতায় বেড়াতে যান। মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক আর্থিক সচ্ছলতা ভালো ছিল। ছেলেকে পুরুলিয়াতে পড়ান। সেখানেও প্রতিমাসে একদিন করে বেড়াতে যান। তার স্ত্রী কাত্যায়নীও পুরো হাসপাতালের সেবিকা। তাদের দুজনের গায়ের রং কালো হলেও কিন্তু ছেলের নাম রেখেছে সুন্দর। গল্প কথকের স্ত্রী কথককে নিয়ে ভীষণ গর্বিত। কিন্তু কথকের চরিত্র ছিল স্ত্রীর উল্টো। সে আক্ষেপ করে সেবিকার স্বামী হওয়ার জন্যে। তাই তিনি চাকরিতে ও সংসারে

মন দিতে পারেননি। স্ত্রীর কোয়াটারে থাকে দুজনেই। বাংলায় কথা আছে— ''নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস/এপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস / নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে / কহে, যাহা কিছু সুখ এপারে।'' (মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ) আমরা আসলে সকলেই সুখের প্রত্যাশী। মানুষের জীবনের এ এক আশ্চর্য রহস্য। নিজেদের ঘোরতর অসুখী ভেবে বড়ো দুঃখ অনুভব করেন আর হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে। নিরুদ্দিষ্ট সুখের জন্য তাই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। কথক পে স্লিপ সহ বেতনের টাকা স্ত্রী-র হাতে তুলে দেন। কিন্তু স্ত্রী ভাবে তার জন্য অনেক কিছু করছে। তবে তাঁদের ভাবের ঘরে একটা সিঁদ আছে। সে বলে, ''আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাসনি। বাধ্য হয়ে বিয়ে করে ছিলে। তেরো বছরের বিয়ের তেরো বছরের ছেলে আমাদের ক্লাস এইটে পড়ে। ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। সব ভালো ছেলেদের যেমন, ফেলুদা পড়ে, টেনিদা, শঙ্কু গোপাল। এমনকি কাকাবাবু সমগ্র তিন খণ্ড শেষ। ছেলেকে আদর দিই, বলি নবীন কিশোর।''[২] তাদের দুজনের মধ্যে দুঃখের কোন নিরসন নেই। তাদের কোন বন্ধুও নেই, নিজেদের মধ্যে বোঝা বুঝির অভাব আছে। তাই কথকের জীবন শূন্য বলেই দুঃখ প্রকাশ করেন।

গল্পকথক ছিলেন একটু ভাবুক প্রকৃতির। তাই পার্বতীকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। সে ছিল তার প্রথম প্রেমিকা। স্ত্রী কাত্যায়নীকে পুরোনো প্রেমের কাহিনি জানিয়ে দেয়। শুধু পার্বতীই নয় তার জীবনে অনেক মেয়েই এসেছিল। তুলসির সঙ্গে ট্রেনে চলাকালীন দেখা হয়। চিন্তামনিও কথকের জীবনে এসেছিল। তাই তিনি পুরোনো স্মৃতি আকরে ধরে বলে— ''চিন্তাকে দেখলাম অনেক দিন পর। দেখব শুধু মুখখানি। চিন্তা আমার প্রেম, আবার প্রাক্তন, প্রতিবেশিহীন এম.এল.এ. কন্যা চিন্তামনি। আজ ওই নৌকায় বসতে পারতাম, ভালা জায়গায় উঠতে পারতাম। মন খারাপ নিয়ে পক্ষী নিবাসের বিচ্ছিরি সব

পাখি দেখে আমার আহ্লাদ হয় না।"[৩] ঊষা মহান্তিও তার জীবনে এসেছিল। তার সঙ্গে গিয়ে বাড়িতে কথোপকথন হয়। সেও কথককে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কথকের জীবনে অনেক নারীরাই এসেছিল তাই সে কাত্যায়নীর মতো মেয়েকে পেয়ে সুখি হতে পারেননি। কাত্যায়নী ছিল কালো ও সেবিকা। এইসব ভেবে স্ত্রীকে কোনদিন সুখ দেয়নি। সেবিকা হিসেবে ভেবে তাকে সব সময় দূরে ঠেলে রেখেছেন। স্বামী হিসাবে কোন কর্তব্য করেননি। তার জন্য অনুশোচনা বোধ করেছেন। তাই আজ সব ভুলে গিয়ে স্ত্রীকে হাত বাড়িয়ে ডাক দেয়— "কাতু, কাত্যায়নী"।

রণবীর পুরকায়স্থের 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' গল্প সংকলনের গল্পক্রমকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। তৃতীয় পর্বের নাম হল— 'কথা প্রসঙ্গ'। এতে আছে তিনটি গল্প যেমন— নৌকাবিলাস, সাদাসিধে, পাখিরাজ্যের এক নিষ্ঠুর রূপকথা। 'পাখিরাজ্যের এক নিষ্ঠুর রূপকথা' গল্পে মুক্ত মনের দুটি চরিত্র চিকু ও মরালী। বিমান বন্দরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও চিকু ও মরালী রেলিং টপকে রানোয়েতে চলে এসেছিল। চিকুর প্রিয় খেলা হল দুটি হাডুডু ও ফেন্সিং। অর্থাৎ চাক্কু খেলায় গ্রাম পর্যায়ে অনেক কৃতিত্ব লাভ করেছে। মরালীও অনেক কিছু জানে, সে জলের সব বিভাগই তার নখদর্পনে। চিকু ও মরালী ছিল দুজনেই গ্রামের মুক্ত পরিবেশে গড়া ওঠা মানুষ। তাই তাদেরকে বিমান বন্দরের নিয়মতান্ত্রীকতায় বদ্ধ রাখতে পারেনি। চিকু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভালোবাসতো। তাই মুরালীকে ছুয়ে বলে— "আঃ কী সুন্দর নীল আকাশ!" বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের নাম করে সারা ভারত থেকে খেলার প্রতিভাদের নিয়ে যায় দক্ষিণ ভারতে। আসলে প্রশিক্ষণের নামে প্রতারণা করা হয়। আসলে তাদের পাচারকারীরা তাদের পাচার করছে। পাচারকারীদের হাতে পড়েছিল চিকু ও মরালী দুই প্রনয়ী। যৌবনের সন্ধিক্ষণ এসে তাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। লেখক চিকু ও মরালীর মধ্য দিয়ে আমাদের

সমাজের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। অনেক ছেলে ও মেয়ে নানা পাচারকারীর কবলে পড়ে জীবন নষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে।

চিকু ও মরালী পাচার হয়েছিল যে বন্দরে সেই বন্দরেই আবার দেখা। তারা কলকাতা যাওয়ার যাত্রী। এই যাত্রাকালীন সময় তাদের আনন্দের কথা প্রকাশ করে। মরালী ও চিকুর কথোপকথন হল— ''এখানেই মজা লাগছে আমার। এখানেই কেন? বা রে! বাংলাউ কথা বলছি আর ...''[৪] মাতৃভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে আনন্দের মেতে উঠেছে।

লেখকের 'তরমুজ' গল্পটি শহরকেন্দ্রিক। শহরের মেয়ে মনমন এমন এক নারী চরিত্র তার কোনটাতেই মন স্থির করে ভাবতে পারে না। সনাতনের নাম, ঝাঁপিরমুখ জায়গার নাম, সনাতনের মাস্টারি চাকরি কোন নামেই তার পছন্দ নয়। এমন কি তার বাবার পুলিশের চাকরিও তার পছন্দ নয়। মনমন এইসব সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নেয় এবং প্রকাশ করতেও দেরি করে না। সনাতনের সঙ্গে মনমনের দেখা সপ্তাহে একদিন। মনমন আর বাকি ছয় দিন না দেখে থাকতে পারছিলেন না। সনাতন যেহেতু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার একটি কর্তব্য বোধ আছে, তাই যখন খুশি আসতে পারছেন না। সনাতনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। দেরি হওয়ার জন্য সনাতন নিজেকে দায়ী করে। কিন্তু যখন একের সঙ্গে অপরের দেখা হয়ে যায় তখন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। মনমনের দৃষ্টিতে সনাতন নানা রকম। মনমন সনাতনকে বলে— ''তুমি ওরকম বুড়োদের মতো সিথি কাটবে না।''[৫] এর প্রত্যুত্তরে সনাতন বলে— ''বা, তোমার হিরোর মতো লাগছে না বলে আমার সিথি বদলাতে হবে?''[৬] রাগ ও সন্দেহ হলেও কিছুক্ষণ পরে ভুলে গিয়ে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সনাতন ও মনমন যে রেস্তোরায় খেত সেই রেস্তরায় সনাতনের দু-ক্লাসের

ছোট গৌরীকে দেখতে পেল। সেই গৌরীই সনাতনকে উৎসাহ দিয়ে এসেছিল ''মেট্রিক পাশ করতে হবে''।[৭] সেই কথা ধরেই সে পড়াশুনা করেছিল। গৌরী রেস্তোরায় সনাতনকে লক্ষ্য করেছিল তা দেখতে মনমনের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই সনাতনকে বলে ''হয়তো আমাকে দেখে ওর পুরোনো প্রেমিকের কথা মনে হয়ে থাকতে পারে।''[৮] এখানে ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রেমের কথা ব্যক্ত করতে চায়। এখন সে চুল থেকে এসেছে দাড়িতে। সনাতন নিজেকেই প্রশ্ন করে— ''আমাকে কি কাদামাটি পেয়েছ? যেমন খুশি গড়বে?''[৯] সনাতনের এখনও আরও সন্দেহ তাদের ভালোবাসা নিয়ে। মনমন সব সময় নিজের পছন্দের কথাই ভাবে। অপরের পছন্দ তার কাছে মূল্যহীন। সনাতনকে সব সময় দেখেছে আনস্মার্ট অথচ নিজের পোশাকের হেলা ফেলা আছে। কিন্তু তা নিয়ে সনাতন ভাবে না। সনাতন কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। এখানেই ধরা পড়েছে সনাতনের সরল মানসিকতা। মনমন এতটাই আধুনিক হয়েছিল যে সনাতন কোনো ভাবেই তার সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি। তাই সনাতন ভাবে— ''পরতের পর পরত, বাঘরখানির ঠিক কত ভিতরে গেলে মনমনকে পাওয়া যাবে।''[১০]

গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থের 'স্বপ্নের ঝামুর ঝুমুর' গল্পে এক নতুন অনুভূতি জাগায় পাঠককে। মানুষ স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন বেশির ভাগ সফল হয় না। এই গল্পটাই শহরকেন্দ্রিক গল্প। শ্যামল নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে তিরির শাড়িটা তার থেকে টেনে নামাতে গিয়ে ছিঁড়ে যায়। স্ত্রী তিরি ছিল গোছানো মেয়ে তাই স্বামী হওয়া সত্ত্বেও ভয়ও পায়। শ্যামল মাকে শ্রদ্ধা করতো। মা বাড়িতে না থাকলে শ্যামলের ভালো লাগতো না। মা গৌহাটিতে বেড়াতে গিয়েছে ছোটো মামার বাড়ি। শ্যামল মার কথা ভেবে চিঠি লিখতে চায়— ''মা গো তুমি না থাকলে ভাল লাগে না, তুমি না থাকলে— কেউ না, তোমার বৌ না, কিছু না, ভালো লাগে না।''[১১] এতে তার ছেলে মানসিকতা ফুটে উঠেছে। রঞ্জন

শ্যামলের বাড়ি আসার কথা ছিল, সে নাও আসতে পারে তবুও আশা ছাড়েনি। রঞ্জন পারুলকে নিয়ে প্রেম করছে। পারুল হল ইস্কুল শিক্ষিকা। এত কিছু জানা সত্ত্বেও শ্যামল শ্যালিকা শিরিকে বিয়ে দিতে চায় রঞ্জনের সঙ্গে। রঞ্জনের বাড়ি ছিল ঝাঁপিরমুখ। এইসব বিষয় স্ত্রীকে জানায়নি শ্যামল। শ্যালিকা শিরির অন্য কোন ছেলের সাথে সম্পর্ক আছে, একথা কল্পনাও করতে পারে না। রঞ্জন না আসলেও শ্যালিকা শিরি এসেছে তাদের বাড়িতে।

শ্যামল শিরির বিয়ে দেওয়ার ভাবনা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলেই ধরা পড়ে যায় তাদের অভ্যন্তরিন রহস্য। তিরি বাধা দিয়ে বলে রঞ্জন ব্রাহ্মন বংশের ছেলে তাদের কাছে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। শ্যামল আশ্বাস দিয়ে বলে রঞ্জন জাতপাতের কথাকে আমল দেয় না। ব্রাহ্মন বংশের ছেলে বলে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তিরির ভিতরেও একটি ভাবনা কাজ করছে, সেটি প্রকাশ করে শ্যামলের কাছে। স্ত্রী জানায় যে শিরির শ্যামলের ছোট ভাই শেখরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আসলে বাইরে থেকে আমরা যা দেখি তা পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে। শ্যামলের ভাবের সঙ্গে কাজের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিয়েই ও বাঁচতে চায় অথচ জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ পরাধীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনকে বিষিয়ে তুলেছে। লেখক চাকরিরত অবস্থায় নানা শহরে ঘুরেছেন এবং নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি সারা জীবন ধরে মানুষের অভিজ্ঞান খুঁজেছেন। জীবনের নানা পর্যায়ে ও পরিস্থিতির যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার গল্পে নিজস্ব ভাষা ও প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বরাক উপত্যকার ছোটগল্প চর্চার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সাহিত্যের মূল ভুবন থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থাকলেও ছোটগল্প নামক শিল্প মাধ্যমের সৃজন চলছে। ‘‘কাছাড়ের সাহিত্যে

সুয়োরাণী কবিতার প্রতাপ বড্ড বেশি তাই দুয়োরাণী গল্পকে দৃষ্টিকটু ভাবে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নিজের মালিন্য ও দৈন্যকে ঢেকে রাখতে হচ্ছে। কাছাড়ে সাহিত্যিক মানেই কবি, গল্পকারদের সংখ্যা প্রকৃত অর্থেই অঙ্গুলিমেয়। পত্রিকা নির্ভর কাছাড়ের সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করেছে কবিতা।"[১২] (তপোধীর ভট্টাচার্য, বাংলা গল্পে কাছাড়, ঝংকার, শিলচর, ১৯৭৩-৭৪) বরাকের সাহিত্যিকদের মধ্যে কবিতার প্রতি টান বেশি থাকলেও চিন্তা ভাবনায় ছোটগল্প নামক শিল্প মাধ্যমটিও ছিল। তবে কবিতার মত বিপুল স্থান দখল না করলেও বরাক উপত্যকার গল্পবিশ্ব মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়। উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় কতগুলি গল্প শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে। সেই ভালো ভালো গল্প প্রচারের অভাবে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। বরাক উপত্যকার ছোটগল্পে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত জানার জন্য মনযোগ দিয়ে পাঠ করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের মূল কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে বরাক উপত্যকা। কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলা নিয়ে বরাক উপত্যকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল বরাক উপত্যকা দেশ ভাগ হবার পূর্বে অখণ্ড সুরমা উপত্যকার খণ্ডিত ভূমি ছিল। ভারত স্বাধীন হবার পর বরাক উপত্যকার অবস্থান হল উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আসামের দক্ষিণে। এই বরাক উপত্যকার প্রধান নদী হল বরাক নদী। আর বরাক নদীর উপত্যকা বলে একত্রে তিনটি জেলার নাম হল বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকা অঞ্চলটির তিনদিক পর্বত বেষ্টন করে আছে। এই অঞ্চলে শুধু বাঙালি নয়, বিভিন্ন জনজাতির উপজাতি বসবাস করছে। আর বরাক উপত্যকার মানুষের মাতৃভাষা বাংলা বলে বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাই আজ বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে নানা রাজনৈতিক সমস্যায় পরতে হয়েছে। এই বরাক উপত্যকার ভাষা ও সাংস্কৃতিক

দিক থেকে বাংলার সঙ্গে মিল রয়েছে। এই বাংলা ভাষাকে নিয়ে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিন এখনও তা সচল রয়েছে।

বরাক উপত্যকা দুই বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে ছোটো সাহিত্য পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বরাক উপত্যকায়— সম্ভার, অনিশ, শতক্রতু, সাহিত্য, সর্পিল, প্রতিশ্রোত, আমাদের সমকাল, প্রবাহ, অক্ষরবৃত্ত ইত্যাদি ছোট সাহিত্য পত্রিকায় গল্পচর্চা হতো।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। দেশ ভাগ মানুষের এক মর্মান্তিক ঘটনা। ‘‘মধ্যরাতে ভারতীয় উপমহাদেশের যে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল, তা একদিকে যেমন গৌরবজনক, অন্যদিকে খণ্ডিত, ট্র্যাজিক। কারণ, একটি নয়, দুটি দেশ জন্মগ্রহণ করেছিল। সাম্রাজ্যের চিতাভস্মের উপর গড়ে উঠেছিল দুটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এতেও হয়তো তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বিভাজন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে স্বাধীনতার ঠিক আগে-পরে দেশের নানা অংশে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। আরো বহুলক্ষ ছিন্নমূল, গৃহহারা হয়েছিল। নতুন মানচিত্র টানা হয়েছিল রক্তের রেখায়। যে সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও দূর হয়নি।’’[১৩] দেশ ভাগ হল সমস্যার কেন্দ্রস্থল। এতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সমস্যা দেখা দিয়েছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচুর মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বর্তমান সময়েও তা বন্ধ হয়নি। এই দেশভাগের ফলে ভাগ হয়ে গেল বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাঙালির ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ সবকিছু। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর। তাতে মানুষ নাজেহাল হয়েছিল। পরে দেশ ভাগের সময় মানুষ আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

দেশভাগের ফলে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়েছিল আসাম রাজ্যে বাঙালিদের। বরাক উপত্যকার ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলার সঙ্গে মিল থাকলেও, এপার বাংলা ওপার বাংলা কোনো বাংলাতে স্থান পায়নি বাঙালিরা। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরে সিলেটের একটা বড় অংশ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে। আর বাকি অংশটা থেকে যায় আসামের সঙ্গে। সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় উদ্বাস্তু হয়ে চলে এল মানুষ এদেশে। এই আসা বিষয়টি সহজ ছিল না, তা ছিল এক যন্ত্রণাময় কাহিনি। সমাজ বিজ্ঞানী সুজিৎ চৌধুরী দেশভাগ ও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেছেন— ''আমরা জন্মেছিলাম ভারতবর্ষে, পরে জানলাম সেটা আর ভারতবর্ষ নয়। এবারে তাই আবার ছুটেছি নতুন ভারতবর্ষের সন্ধানে। রাজনৈতিক ভূগোলের ভারতবর্ষে আমরা ঢুকলাম আধঘন্টার মধ্যেই কিন্তু পিতৃপুরুষের স্বপ্নের ভারতের সন্ধান এখনও চলছে।''[১৪] ১৯৪৭ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত, আবার ১৯৫১ এর দাঙ্গায় আরো কিছু উদ্বাস্তু, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও প্রচুর উদ্বাস্তু আসে এখনও আসছে।

লেখক রণবীর পুরকায়স্থের রচিত 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' গল্পটি 'কবিতীর্থ' (২০০২) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে লেখক বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। পবনপদবির মতে— ''দুয়োরাণীর সন্তান বরাক বাংলা নিয়ে এত গর্বের কী আছে? বাকি দুই ভাগ তো চেনেই না কোথায় হাইলাকান্দি কোথায় শিলচর, করিমগঞ্জ। একুশের শহিদ সালাম বরকত যত চেনা উনিশের কমলা শচীনকে চেলে কতজন?''[১৫] পবনপদবির কোথাও বেড়াতে যান না কারণ তার পা ল্যাংড়া। তাই বরাককে সে মাতৃভূমি হিসেবে দেখেছেন। তার পা ল্যাংড়া হয়েছিল ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনে এগারো জন শহিদ হয়েছে। এই শহিদের শোক মিছিলের জন্য যাত্রা করেছেন পবনপদবি। ভাষা শহিদের কথা কেউ ভুলতে পারবে না কোনও দিন। শিলচরে ভাষা আন্দোলনের পরে কলকাতা

থেকে প্রতিদিন নানা নেতারা আসেন। এন.সি. চ্যাটার্জিকে মাল্যদানের সময় সদরঘাটে একটি মেয়ে বলে 'রক্ত দেব ভাষা দেব না'। এই মেয়েটি পথে গান গেয়ে বেড়িয়েছে। সে শিখেছে বাংলা ভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো। ''তৃতীয় ভুবন পত্রে তাই নেই কোন বিজ্ঞাপনের বাজার নেই বাঁধা গতের গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস, নেই কোনও শারদ সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা। সব সংখ্যাই এখানে বাংলাসংখ্যা, তৃতীয় ভুবনের বাংলা।''[১৬] উনিশশো একষট্টি সালে উনিশে মে বরাক উপত্যকায় যে ভাষা সংগ্রাম হয়েছিল তা একটি মর্মান্তিক ঘটনা।

'শহিদনামা' গল্পটি 'আরম্ভ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের চরিত্র দেবদত্ত শহিদের নাম কিছুতেই মনে করতে পারে না। কিন্তু ঘাতকের দল মেরে ফেলার পর শালা বলে গালি দেয়। ঘাতকের দল মেরে ফেলার পরেও শান্তি পাচ্ছে না তাই আর কিছু গালাগালি করে। নিষ্ঠুর ভাবে মানুষকে হত্যা করেছে। যারা শহিদকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছে তারা কোনো ধর্মের মানুষ নয়।

দেবদত্ত ছিলেন একজন কবি। তিনি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হোমিয়োপ্যাথির শিক্ষক। তার বাকি বন্ধুরা বলে 'বাংলার সাবজেক্ট টিচারকে নিয়ে অবজ্ঞার মজা। দেবদত্ত গায়ে মাখে না।' আসলে আমরা বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করি। অন্যের মুখ থেকে বাংলা ভাষা শুনতে তা নিয়ে হাসাহাসি করি এই হল বাঙালির একটি বড় দোষ। ''পিঠ পুড়লে আগুন নেভাতে হবে না ফিরে শুতে হবে জানে না দেবদত্ত। তেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি তো হয়নি। দুম করে শহিদ বানিয়ে দিলে হল! সরল মানুষের সোজা যাত্রাপথের প্যাচপয়জার একটু জেনে না নিলে অবিচার হবে। সহজ সমাধানের শাস্তি শহিদ হওয়া নয়। তাই দেবদত্ত একটা ফন্দি এঁটেছে। সিমেন্টিং প্রক্রিয়ায় এ কথা থেকে ও কথায় গিয়ে ভিত দেওয়া। বাড়ি তৈরি করা। কারা যেন বাড়ি করছে গগনচুম্বী আশায়!''[১৭] দেবদত্ত সবসময় সুখের কথা ভাবতেন। তিনি একটু ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন

তাই শৈশবের কথা উঠলেই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। ''ভাবুক মানে মধ্যবিত্ত। গ্রামের নয় শহরের নয় ঘরের নয় ঘাটের নয়। মাঝামাঝি মানুষ হয়ে নিজেকে কনট্রিডিক্টর করা।''[১৮] তিনি ভারতের সব বাঙালিকে এক হওয়ার জন্য স্লোগান করেছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল ছত্তিশগড়, ভিলাই, শিলচর, তেজপুর, গুয়াহাটি। দেবদত্তর কাছে মুসলমান যে বাঙালি হতে পারে তা জানা ছিল না। কারণ মুসলমান মুসলমান বাঙালি নয়। আসলে যারা বাংলায় কথা বলে তারা সবাই বাঙালি, হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে দেখা হয় না।

আব্দুল জব্বর ও দেবদত্তের মধ্যে দাদা-ভাই সম্পর্কে তৈরি হয়ে যায়। আব্দুল দেবদত্তের কাছে ধর্মীয় উপদেশ নেয়। কিন্তু আব্দুল এখন ধর্ম বিষয়ে দুটানায় পড়েছে। উপস করলে স্ত্রী সহ্য করতে পারে না। আর রোজা না করলেও বিপদ। দেবদত্ত তাকে সহানুভূতির সঙ্গে জানায়, সমাজে বাঁচতে গেলে রোজা পালন করতে হবে, তা না হলে সমাজে এক ঘর করে রাখবে। এখানে সমাজকে বড় করে দেখিয়েছেন লেখক। সমাজ হল একটি গণ্ডির ন্যায়--অন্যায়ের ধার ধারে না যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তা সকলকেই মানতে হয়। এর অন্যথা হলেও বিপদ। তাই মানুষ ধর্মের কাছ থেকে রেহাই পায় না। আমরা যতই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে চাই ততই যেন সমাজ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

মোল্লাপাড়ার মনসামন্দিরের ভিজিটিং পুরোহিত হল অর্চিস্মান শিকদার। তারও দরকার আব্দুল জব্বরকে। হিন্দুরা মুসলমানকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দেয় না। অথচ প্রয়োজনে নাম পাল্টে ঢুকিয়ে ফেলে কৌশলে। এখানে লেখক দেখিয়েছেন সমাজের সংস্কারের ভয়ে মুসলমান ব্যক্তিরা নাম পরিবর্তন করেছেন। তাই দেবদত্তকে বলতে শুনি— ''বাপু ব্যবসায় একটু কটুকাটব্য হয়। না হয় গুরুভাবে বলে ফেলেছেন লঘু। মনসুরকে মনজিৎ করে পাঠালেই ঢুকে যেত ল্যাঠা। আমার

বাড়িতেও এক সাইদা সারদা নামে কাজ করেছে অনেকদিন।"[১৯] আব্দুল জব্বার ছিলো মুসলমান মিস্ত্রি সে থাকে ঘটক পুকুরে। তাই দেবদত্তের স্ত্রী তার বাড়ি যেতে রাজি নয়। ঘটকপুকুর ছিল গ্রাম। বৃষ্টি হলে কাদা ও নোংরা জমে এবং সাপের উপদ্রব আছে। কিন্তু দেবদত্তের ভালো না লাগলেও তার ছেলে মেয়েদের ঘটকপুকুর গ্রামটি ভালো লেগেছিল। দেবদত্ত ও তার ছেলে দুজনে পুকুরে স্নান করেছে। মেয়ে দেবিকা দত্ত সেখানে গিয়ে মুসলমান পরিবারের বৈশিষ্ট্য তাদের আচার আচরণ লক্ষ করেছে। হিন্দু ও মুসলমানদের কি কি মিল ও অমিল লক্ষ করেছে। দেবিকা দত্ত বলেছে, ''কাকি তোমরা ওরকম কর কেন? আমার মামার বাড়ি কিন্তু ওরকম ঘোমটা দেয় না। কানের দুপাশে ঢুকিয়ে দেয়না পাড়। তোমরা সিঁদুর পর না কেন? দাদু কেন ওরকম দাঁড়ি রাখে? গোঁফ কাটা দাঁড়ি দেখলে আমার ভয় করে।"[২০]

দেবদত্ত আব্দুল জব্বারকে শোনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা। উপন্যাসের চরিত্র হোসেন মিয়াঁ কলকাতায় জন্মালে তার নাম হত সুভাষচন্দ্র। ''হোসেন মিয়াঁ কেবল স্বপ্নের দূত নয়, সে বাহির বিশ্বের দূত কলকাতার সঙ্গে তার যোগ আছে। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সে সম্পর্ক রেখে চলে। কলকাতা থেকে সে পেয়েছে সাহস। প্রযুক্তিগত কৌশল, অজানা সমুদ্রে কম্পাসের ব্যবহার; আফিং-এর চোরাচালানি আর গরু ছাগলের প্রকাশ্য চালানের মাধ্যমে হোসেন মিয়াঁ আধুনিক দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তাই 'পদ্মানদীর মাঝি' হয়ে উঠেছে আধুনিক উপন্যাস। পদ্মা তীরবর্তী প্রবাহমান জীবনযাত্রার সরল আলেখ্য-মাত্র নয়।"[২১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়াঁ চরিত্র অঙ্কন করেন গভীর রোমান্টিক ভাবে। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখকের গভীর জীবন অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। হোসেন মিয়াঁ পদ্মানদীর মাঝিদের কাছে এক অজানা শক্তির ইঙ্গিত। এই অনিবার্য শক্তির সাহায্যেই মাঝিরা চলে।

হোসেন মিয়াঁর রোমাণ্টিক বাস্তব জীবন নিয়ে গঠিত। হোসেন মিয়াঁর চরিত্রে মধ্যেই স্বয়ং লেখক অজান্তে উপস্থিত আছে। অধ্যাপক বার্ণিক রায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আধুনিকতা ও হোসেন মিয়াঁ চরিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'হোসেন মিয়াঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক এই উপন্যাসে নিজের আদর্শ, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, এবং প্রতীক ব্যবহার করেছেন উপন্যাসের পরিকল্পনার মধ্যে। চরিত্রটি জটিল ও রহস্যময়। প্রতীকে উধ্বচারী, আবার বাস্তবে, পাপপুণ্যে, ভালোমন্দ, চাতুর্যে ও উদারতায়, বৈষয়িকতা ও শয়তানিতে অদ্ভুতভাবে জীবন্ত, অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিভূ সে। অথচ সে এই গরিব জেলেদের ভালো করতে চায়। সে মুসলমান অথচ হিন্দু-মুসলমান তাঁর কাছে সমান, তার কাছে এরা মানুষ। হোসেন মিয়াঁ স্বপ্নে থাকে, স্বপ্ন তাকে তাড়িত করে, শুধু তাকে নয় গরিব জেলেদেরও তাড়িত করে স্বপ্নের সঙ্গী হবার জন্যে। এই স্বপ্নের জন্যেও এই উপন্যাসের আঞ্চলিক স্থানিকতার সংকীর্ণতা দূর হয়ে গেছে, নদী যেমন সাগরে মিশেছে, তেমনি এই উপন্যাসও বিস্তৃতি লাভ করেছে কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপে, ময়নাদ্বীপে যাওয়ার পথে পদ্মার আত্মিকতা হারিয়েছে, সেই আত্মিকতার সঙ্গে কেতুপুরের স্থানিকতাও। এই রহস্যময় স্বপ্ন পাগল বলেই হেসেনের বাস্তব চরিত্র, তার জীবনের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ লেখক দেয়নি। দরিদ্র ও নগণ্য হলেও যে তাদের মধ্যে স্বপ্ন থাকে, সেই স্বপ্নকেই হোসেন মিয়াঁ ছাড়িয়ে দিয়েছে তার স্বপ্নের ময়নাদ্বীপে এদের নিয়ে গিয়ে।"[২২]

'প্রতিরোধ কমিটি' গল্পটি 'সম্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রমা প্রসাদ নন্দী 'স্বভূমি'তে লেখা দিত। তিনি লিটিল ম্যাগাজিনে লেখতেন, লিটিল ম্যাগাজিন লেখা দিয়েই সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু তার লেখাকে কটাক্ষ করেছেন একলেমুর আর সুদিন দত্ত গদ্য সম্পাদকরা। উনিশশো সত্তোরে যারা লেখা শুরু করেছিল একসঙ্গে তাদের মধ্যে অনেকেই সরে পড়েছেন। কারো কাছে তিনি হয়েছে

ঈর্ষাপরায়ণ। স্যমন্তক নরনারায়ণকে গল্প লিখতে বলেছে। আগে নরনারায়ণকে গল্পকার বলে ভাবতো না, তার গল্পকে রিপোর্ট বলে মনে করতো। সে রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করে শ্রেণিবৈষম্যের গল্প লিখত। তাই গল্প বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়— ''পান্নালাল তাত্ত্বিককে বলল, আচ্ছা বলতো পদ্মা ডিকনস্ট্রাকশন ব্যাপারটা কী? তপোধীর টপোধীর সবাই খুব লিখছে আজকাল। 'বিনির্মাণে রামরহিম' গল্পটাই এরপরের বার গল্পকথা পুরস্কার জিতে নিল। পান্নালাল ও নরচন্দ্রের সাহিত্যজ্ঞান নিয়ে পনেরো মিনিটে সাজিয়ে দিল নতুন বিনির্মাণ তত্ত্ব। রন্ধনশালার মশলাচুরির কথা একবারও বলল না। এই নিয়েই, নেই মেধা, মধ্য মেধার সাহিত্য সংসার এখন বাংলায়।''[২৩]

রমা প্রসাদ নন্দী এখন গল্প লিখছে না, কিন্তু কথা বলার ক্ষেত্রে খামতি নেই। তিনি লিটিল ম্যাগাজিনে গল্প লেখেন। রথীন, বাঁধন, মনোময়, নরনারায়ণ এরা প্রত্যেকেই তাকে উৎসাহিত করছে গল্প লেখার জন্য। তারা বার বার বলছে রমাদা গল্প লেখো। তারা আন্তরিকতার সহিত বলাতে সে রাজি হয় গল্প লিখতে।

প্রশান্তর কাজ থেকে জানা যায় মণিপুরের মহিলারা সব মদের ভাটি বন্ধ করে দিয়েছিল। যদি স্বামী ও সন্তান মদ্যপান করতো তাহলে দলবদ্ধ ভাবে পিটুনি দিত। এতে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ মহিলারা অনেক অত্যাচার সহ্য করে এই প্রতিবাদ করতে নেমেছে। মদ্যপান করলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মদ্যপান কার আইন বিরুদ্ধ, আইনের পক্ষের লোক কখন আসবে সেই অপেক্ষায় মহিলা বসে থাকেনি। প্রশান্ত রমা প্রসাদ নন্দীকে কখন নাম ধরে ডাকে আবার কখনো দাদা বলেও ডাকে। রমা প্রসাদ নন্দী খাদ্য আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন।

কবি প্রশান্ত অনেক কবিতা লিখেছেন। তিনি বিদ্রোহের কবিতা লিখেছেন।

নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, রিজ কাণ্ড, সুশীল সমাজ নিয়ে লিখেছে। কিন্তু লেখিকা তসলিমাকে নিয়ে এক লাইনও লিখে নাই। আর রমা প্রসাদ নন্দী দাপুটে মানুষ ও দাপুটে লেখক। কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে। অনেকেই সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে বড় বড় ভাষণ দেয় কিন্তু রমা কাজ করে দেখিয়েছে। রমা নিজের বাড়ি একতলা বিক্রি করে দিয়েছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে। রমা প্রসাদ নন্দী বন্ধুর কন্যা সুখিকে ভালো থাকার জন্য কামনা করেছেন। প্রশান্তর বাড়িতে গিয়ে প্রশান্তর মেয়ে ও বউকে দেখে মনে হয়েছে তারা যেন অন্য দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু প্রশান্ত সব সময় মদ্যপানে আসক্ত থাকে। তাই তাকে মদ্যপান করতে নিষেধ করেছে রমা প্রসাদ। প্রশান্ত তাকে জানায় সেই নাকি তার দাদা ও গার্জেন। রমা আক্ষেপ করে বলে— ''দুস শালা! তুই ওসব ছেড়ে দে। তুই হলি রিয়্যাল ম্যান। ম্যান হতে গেলে পরিবার লাগে। মেনকার মতো বউ কেন ঘরে ঘরে হয় না রে?''[২৪] পুঁজিবাদের হাত থেকে নিজেদের সংসার বাঁচানোর জন্য প্রতিশোধ করতে চেয়েছে প্রশান্ত ও রমা প্রসাদ নন্দী।

'দধিয়া' গল্পটি অমৃতলোক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। দধিরাম কর্ণবাহাদুর সিং এর সাহস, সংগ্রাম ও ওৎ পেতে থাকার কাহিনি রয়েছে এই গল্পে। দধিরাম বাংলা, বিহারী, নেপালি এই তিনটি ভাষাতেই পারদর্শি। ব্যারাকের বন্ধুরা দধিরামকে মান্যও করে আবার সুযোগ পেলে শয়তানিও করে। দধিরাম সব সময় সৎ পথে চলেছে। কাউকে সে অসন্তুষ্ট করে না। তাই তার চরিত্রে ধরা পড়ে— ''উপরওয়ালাকে অসন্তুষ্ট করে কোন কাজ করে না সে। ওখানেও তার উত্তল ষোলআনা। বড়বাবুই হোক আর মেজ ছোট এমনকি ডি.এস.পি. সাহেবের বাড়িতেও বিলাইতি পৌঁছে দিয়েছে সময় মতো।''[২৫] দধিরামের পিতা ছিল বিহারের পুলিশের কনস্টেবল। তাই এস.পি. সাব দধিরামের ইন্টারভিউ না নিয়ে পুলিশের চাকরি দিয়ে দেন। সাহেব ভেবে ছিল দধিরাম বিহারী। তার অন্ধ বাবা ছিল তার

জন্য মনে কষ্ট হতো। দধিরামের পোস্টিং হল কোচবিহারে। সেখানে ছিল তার বন্ধু মহত রাজবংশী। তার বাড়িতে সব সময় যাতায়াত করতো। মহত রাজবংশীর স্ত্রী মহারাণী, তার বয়স তখন কুড়ি বছর। তখন থেকেই দধিরামের সংগ্রাম শুরু। সে আগাম প্রস্তুত নিয়ে চাকরি বদলি করে হমদিপুর। দধিরামের সব সময় ওৎ পেতে থাকত ইনকাম করার জন্য। হঠাৎ একদিন মহারাণীকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল। দধিরাম প্রচণ্ড সাহসী ছিল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও ছিল। মহত রাজবংশী বন্ধুর সহায়তায় সুযোগ নিয়ে তার সংসার জীবন নষ্ট করে ছিল। এই চরিত্রের জন্য সমাজে আজ বিশ্বাসকে মানুষ হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

দধিরামের ছেলে অর্জুন বাহাদুরকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চায়। ছেলে এখন বড় হয়েছে, নবম শ্রেণিতে পড়ে। ছেলেকে কলকাতার নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখাবে। দধিরামের মনে এই পিতৃসত্তা জেগে উঠেছে। তিনি ছেলেকে ভিক্টোরিয়া জাদুঘর দেখাবে। মিউজিয়ামে রাখা আছে পুরানো ডেডবডি। ছেলেকে দেখানোর সঙ্গে নিজেরেও দেখা হয়ে যাবে। এতে পিতা ও পুত্রের আনন্দে ভরে উঠবে মন। দধিরামের পিতার ইচ্ছে ছিল 'শিবজিকে একটা মন্দির ভি থাকবে'। দধিরাম তার মাকে বার বার আশ্বাস দেয়— ''ব্যস ব্যস মাই, তোহার সব খোয়াইস পুরা হবে। তিরথ ভি হবে, মকান বাড়ি ভি হবে।''[২৬] দধিরাম তার বাবার কাছে কোনো দিন আদর পায়নি বলে আক্ষেপ করেছে। অথচ দধিরাম তার ছেলেকে যথেষ্ট আদর করে। দধিরাম ঘুষ খায় বলে তার বাবা কথা বলে না। কিন্তু দধিরামের বাবা কখনো ঘুষ নিতেন না। এখন ছেলের জন্য ভাবছে যে ছেলেকে নিজের মতো করতে পারেননি। কারণ ঘুষ খাওয়া পছন্দ করেন না। দধিরামের বাবা মাছিমপুর ছেড়ে কলকাতায় আসবে না কিন্তু তার মাও পিতার অনুসরণ করেছেন।

লেখক রণবীর পুরকায়স্থের গল্প সংকলন 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা' প্রকাশিত

হয় ২০১৩ সালে। এই গল্প গ্রন্থে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় গল্পটি হল 'ওরা দুই দৌবারিক' গল্পটি। 'আরম্ভ' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি শুরু হয়েছে— ''অলৌকিক বিশ্বাস নেই রামুর। শামুরও নেই। আবার দুজনেই ধর্মবিশ্বাসে কট্টর।''[২৭]

শামসুদ্দিন আনসারির মাংসের দোকান আছে শীতলা পাড়ায়। সে খাসি জবাই করে বিসমিল্লা বলে। আর রামেশ্বর সাউয়ের সোনার দোকান আছে নতুন পাড়ায়। সেও সোনায় খাদ মেশাতে গিয়ে গণেশ, বিশ্বকর্মা ঠাকুরকে প্রণাম করে মেশায়। রামেশ্বর সাউ হলেন বিহারী, এখন বাঙালী লক্ষ্মীকে বিয়ে করে বাঙালী হয়ে গেলেন। তাই গল্পের শুরুতে লেখক যে পূর্বাভাস দিয়েছেন তেমনি পাঠককে ধাঁধিয়ে তুলেছেন।

দুইটি ধর্মের মানুষ পাশাপাশি আছে দিব্যি। রামু ও শামুর সন্তানেরা দুই বাড়িতে সমান ভাবে ঘুরে বেড়ায়। রামুর একমাত্র কন্যা রাণি ভবানী, আর শামুর তিনটি ছেলে এনায়েত, ইয়াসের ও খোকন। দুই পরিবারের বন্ধুত্ব বাড়ে। রামু ও শামু দুজনে সুখ দুঃখের গল্প করে। রামুর দুঃখ তার কোনো ছেলে নেই, তেমনি শামুরও কোনো মেয়ে নেই। তাই দুজন দুজনকে সান্ত্বনা দেয় বলে, ''লে লে দোস্ত। আমার যে কোনও একটা নিয়ে লে। আজ সে তেরা।''[২৮]

এই গল্পের শেষ পর্বের কাহিনি তুলে ধরেছেন লেখক। এতে পাঠককে কিছুটা ভাবিয়ে তুলেন। জন্মের পরের দিন রামু ও শামু ছেলে মেয়ে পাল্টা পাল্টি করে। এনায়েতের মা নার্গিসও বলে দেয় রামুকে,— ''আপকা বেটা।'' এনায়েত নামের মধ্যে ধরা পরে অন্য ধর্মের মানুষ, তাই রামু এনায়েতের নামের পরিবর্তে ইনু ডাকতে চায়। নামের মধ্যে ধরা পরে কে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ। এই দিক থেকে রামুর মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরা পড়ে। দুই বন্ধুর ধর্মের বিভেদ ভুলে এক হবার

কথোপকথন করে। কারণ দুই ধর্মের মানুষ এক সাথে থাকা কোন সমাজেই মেনে নিতে পারে না। আর দুই বন্ধু এই সব ধর্ম-টর্ম মেনে নিতে পারে না। তারা মেলামেশা করে থাকতে চায়। ধর্ম আলাদা হতে পারে কিন্তু তারা তো মানুষ। মানুষই হল বড় পরিচয়, তারা এই পরিচয়টি ধরে রাখতে চেয়েছে। রামু ও শামু দুজনেই রাণি ভবানীকে দূরে রাখতে চায় না। তারা খুব স্নেহ করে ভবানীকে।

এই গল্পের মধ্যে কুকুর ও কুকুরীর কাহিনি আছে। রামুর পুরুষ কুকুর হল বোম। আর শামুর স্ত্রী কুকুর হল মোম। লেখক কুকুরের মুখ দিয়ে কথা বলিয়েছেন। রামুর বোম শামুর মোমকে বলে—

"— শুধু এই মিছিমিছির লাঠি তরোয়াল খেলে আর বুক চাপড়ে কী লাভ? শোকের কালো পোশাক পরে তাজিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। এরচে ভাল না সত্যি সত্যি লড়াইয়ে নেমে পড়া সবাই মিলে। লড়াই শেষে পক্ষ থাকবে না কোথাও, সব বিরুদ্ধতার নির্মূলে জেগে উঠবে নতুন জাতি নতুন মানুষ। আমাদের সত্যিকারের প্রভু হয়ে উঠবে মানব। একাকার হয়ে যাবে সব। এক রং, এক ধর্ম, এক জাতি হয়ে বিভেদ ভুলে।"[২৯]

এই কথা শুনে মোম জানিয়েছে এই দায়িত্ব নেওয়ার কেউ নেই। সবাই তাকিয়ে দেখে।

রামু ও শামু দুটি পরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠান হলে প্রচণ্ড ভাবে তারা মদ পান করে। কারণ তখন থাকে তাদের মধ্যে সামাজিক বাধা। পাঁচে ডিসেম্বর রাণি ভবানীর জন্মদিন। সেইদিন রামু অনুষ্ঠানে থাকতে পারে না। শামু রামুকে কাছে না পেয়ে দুই বন্ধু মদ পান করে। দুটি পরিবারের সামাজিক দিক থেকে অনেক অমিল। তাই কুকুর দুটি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়। তারপর রামু ও শামু এই সামাজিক বাধা তুলে দিতে চেয়েছেন। রামু শামুকে বলে—

''আমরা ওদের ঘটা করে বিয়ে দিই চল। সমাজের অপেক্ষা করে লাভ নেই। সমাজ যেদিন পাল্টাবে। ঘরের ভিতরটা তো আমাদের, কুকুর দুটোও আমাদের। বলেছি না নেক্সট জন্মদিন কিংবা ধর্মদিন থেকে সব বদলে যাবে। শামুর বাড়ি রামুর বাড়ি আলাদা থাকবে না কিছু।''[৩০] লেখক এই গল্পের মধ্যে দু'টি সম্প্রদায়ের মিল দেখাতে চেয়েছেন। নাটকের মত সংলাপে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে গল্পটি।

লেখক রণবীর পুরকায়স্থের রচিত 'আপদ্ধর্ম' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'পরম্পরা' পত্রিকায়। এর পরে 'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা' গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়। লেখক গল্পের শুরুতে কথার ছন্দ মিলিয়ে কাহিনি বর্ণনা করেছেন। পাঠককে প্রথমেই একটু সতর্ক হতে হয়। কারণ নামকরণের ক্ষেত্রে একটু কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর গল্প পড়ার ক্ষেত্রে এই কৌশলটি জানা না থাকলে কাহিনি গুলিয়ে যায়। তাঁর এই গল্পের শুরু হল— ''শিবরাত্রির দিন শিবু মামা যাত্রা শুরু করেছিল চেম সিঙের দোকান থেকে সিঙারা ও চা খেয়ে পঁচাত্তর পয়সার, তারপর মতিনগর থেকে জিলিপি পাঁচটা দু'টাকার, মোট খর্চা পাঁচ টাকা।''[৩১] তাই দেখা যায় শিবরাত্রির সঙ্গে শিবুমামা ও চেম সিঙের সঙ্গে সিঙাড়ার কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে আমরা সহজেই চিনতে পারি।

শিবুকে লতিকা মামা বলে ডাকে। কারণ সকলেই তাকে মামা বলে ডাকে। শিবু নিজেকে কুলি ভাবতে দ্বিধা করে। সে নিজেকে রিফুজি বলে ঘোষণা করে। পঞ্চুচরণ দাসের ছেলে শিবচরণ। লতিকার বাবার সঙ্গে শিবরাত্রির দিন সিদ্ধি খেতো। সাইকেলে চরে মতিনগর যেতো। সেখানে উঠে যেতো ভুবন পাহাড়ে। লতিকা উগ্রপন্থীদের উপদ্রবের কথা জানতে চেয়েছে। তখন শিবু মামা বলে— ''আমারে কিগুয়ে ধরত? কতগুরে ধরিয়া অলা, অউ অলা ইটাইয়া ফালই দিছি পাহাড়ো। তখন ইতা আচিল না, মিজোরাম উম আছিল না।''[৩২]

'কথার কথা' পরিচ্ছেদের মধ্যে লেখক বরাক উপত্যকার স্থানের নান উল্লেখ করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ দেশ ভাগের পর উদ্‌বাস্তু হয়ে জলজঙ্গলের পথে পাশে মাঝারি এক উচ্চভূমিতে বসবাস শুরু করে। বসবাসকারীরা এই স্থানের নাম দেন সতেরো নম্বর ক্যাম্প। তারপর এই নাম হয় 'সত্র নম্বর'। কিন্তু এই 'সত্র নম্বর' স্থানে কোনো জলের সুব্যবস্থা না থাকায় আবাসিকের মনে দুর্ভাবনা দেখা যায়। লেখক এখানে দৈব বাণী প্রকাশ করেছে— ''এক দুর্যোগের রাতে হয় চমৎকার। টিলা ভেঙে দুফাঁক হয়, পাহাড় থেকে নেমে আসে জল। হয় জলাধার। গড়ে ওঠে স্থায়ী জনপদ সোনাছড়া নামে।''[৩৩] আসলে মানুষ যখন উদ্‌বাস্তু হয়েছে তখন মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে বাসস্থানের উপযোগী করে তুলেছে। এই উদ্‌বাস্তুরাই বন কেটে বসতি স্থাপন করেছে, টিলা কেটে ঘর তৈরি করেছে, অপথে পথ তৈরি করেছে, অঘাটায় তৈরি করেছে ঘাট। এইভাবে মানুষ আবার জীবনে নতুন করে সাজিয়েছে স্বদেশ।

রণবীর পুরকায়স্থের রচিত 'কথায় কথায়' গল্পটি সাতটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দুটি চরিত্রের কথোপকথন দিয়ে শেষ করেছেন। গল্পের কাহিনি নাটকিয়া সংলাপের মত কাহিনি এগিয়ে চলেছে। গল্পটি মান্যচলিত ভাষায় রচিত। প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে 'পূর্ণিমা— আফজল' চরিত্র দুটির কথোপকথন। পূর্ণিমা ও আফজল এরা দুজনেই প্রতিবন্ধি। আফজলের একটি পা নেই আর পূর্ণিমার একটি হাত নেই। এই দুজনেই বুঝতে পারে তাদেরকে অনেকেই করুণা করে। আফজল মাঝে মাঝে নিরাস হয়ে পড়ে কিন্তু পূর্ণিমা আশাবাদী। সে আফজলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— ''যত উদ্ভট ভাবনা তোর। দেখিস একটা হিল্লে হবেই, কোথাও না কোথাও জুটে যাবে। কথায় আছে জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।''[৩৪] পূর্ণিমা সত্যচরণদার সাহায্যের কথাও জানায় আফজলকে। মুড়ি, মধু, ধূপকাঠি এই সব বানানোর পর সত্যদা বিক্রির

ব্যবস্থা করে আমাদের মাইনের ব্যবস্থা করেছেন।

এই গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হল 'মন্ত্রী-প্রদ্যুম্ন'। তাদের কথোপকথনে জানা যায় মন্ত্রীর প্রচণ্ড টাকার লোভ আছে। তাই মন্ত্রী প্রদ্যুম্নকে বলে— ''কাগজ পড়তে হয় না রে পাগলা, ছবিটা আমিই দিয়েছি কমলাক্ষকে টাইট দিতে। এত ঝামেলা করে টাকা স্যাংশান করলাম, এখন বলছে সব টাকায় রাস্তা হবে, দেবে না কিছু বুঝ শালা এম.এল.এ কেমন লাগে! ভাল মানুষির ভূত এবার কিলিয়ে সোজা করবে পাবলিক।''[৩৫] মন্ত্রী রাস্তার অজুহাত দেখিয়ে টাকা আদায় করার পেছনে নিজের লালসা রয়েছে। আর সেই আশাপূরণ না হলেই গণ্ডগোল বাঁধে। মন্ত্রীর চেলা হিসেবে কাজ করেছে প্রদ্যুম্ন।

মন্ত্রী বুদ্ধ বিশ্বাস অত্যন্ত কটুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। যে সব সময় উন্নয়নের পথ দেখান সাধারণ মানুষকে। কারণ উন্নয়নের জন্য অর্থ আদায় করতে হয়। তার একটাই লক্ষ কি করে অর্থ রোজগার করা যায়। তাই মন্ত্রী বলে— ''সোজা আঙ্গুলে না হলে করতে হবে। আমি আলোচনা ফনায় বিশ্বাস করি না। ডিরেক্ট অ্যাকশন। বাপুজি বলেছেন করেঙ্গে আউর মারেঙ্গে।''[৩৬] মন্ত্রী বাপুজির কথাটি উল্টো করে বললেন। অর্থের লোভে মানুষ হত্যা করাও তার দ্বিধা নেই। বাপুজি পরাধীন দেশ স্বাধীন করার জন্য মরতে চেয়েছিল আর মন্ত্রী অর্থ হাতানোর জন্য মানুষ মারতে চেয়েছে। 'সাহারা আশ্রম অর্থাৎ প্রতিবন্ধী এন.জিও সেক্রেটারি হলেন সত্যচরণ। তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারছে না দেখে তাকে সরানোর চেষ্টা করছে মন্ত্রী বুদ্ধ বিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ হল 'প্রদ্যুম্ন-সত্যচরণ'। সত্যচরণ সত্যবাদি চরিত্র। প্রদ্যুম্নকে ভালো কাজের জন্য সাহস দিচ্ছেন। ভালো কাজ করতে গেলে অনেক বাধা বিপত্তি থাকবেই তা দেখে ভয় পেলে চলবে না। সৎ কাজের মধ্যে দিয়ে এগোতে

হবে তবেই প্রদ্যুম্ন সত্যচরণের কাছে মন্ত্রীর গুণগান করছেন যেন সে কিছুতেই জানে না। সত্যচরণের ভিতরের কথা সব বের করে নিচ্ছে। বর্তমান সমাজে এই রকম কটু চরিত্রের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের চরিত্ররা ভয়ানক হয়। প্রদ্যুম্ন সত্যচরণকে ভুলিয়ে সাহারা আশ্রমটা বাগবাহারে নিয়ে যেতে চাইছে। সত্যচরণ নিজের জন্য কিছু করছেন না, সবই করছেন প্রতিবন্ধীদের জন্য। তাই বাগবাহারে যেতে দ্বিধাবোধ করেন ডাকাতের ভয়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ হল 'সুবল-আফজল'। সুবল মন্ত্রীদের ভাওতা জানতে পেরে আফজলকে বলেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ হল 'প্রদ্যুম্ন-সত্যচরণ'-র কথোপকথন। প্রদ্যুম্ন আহ্বায়ক ও ছাত্র নেতা সেজে কিছু টাকা কালেকশন করার দায়িত্ব নিতে চায় 'সাহারা আশ্রম' উদ্বোধনের দিন। তাই সে সত্যচরণকে সরাসরি জানায়— ''আমি গুণে নেব। ফিফটি ফিফটি না হলে উদ্বোধন ক্যানসেল।''[৩৭] ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হল 'আফজল-সুবল' এতে আফজলের কথনে জানা যায় মন্ত্রী অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিবন্ধীদের জন্য। আসলে নেতারা মানুষকে বেশি বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখাই কাজ। নেতাদের প্রতিশ্রুতি কোন দিন কার্যকর হয় না। ভোটের লোভে সাধারণ মানুষকে টোপ দেয়। আর এই টোপ গিলে সাধারণ মানুষ ভুলে থাকে। রাজনীতির নেতারা অর্থের গন্ধ পেলে মাঝির মতো ছুটে আছে। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটকে রহিমের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— ''এই রকম মানুষগুলার মান নাই কিন্তুক লাভের হুঁশ আছে পুরা। ফায়দার গন্ধ পাইলে ঘস্‌টি ঘস্‌টি সব কামে যায়া ইয়ারা জুটে— সরফরাজি করিয়া মজা মারে।''[৩৮]

তথ্যসূত্র :

১. পড়ুয়ার ছোটগল্প, তপোধীর ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৬৭

২. কাত্যায়নী কথা, পৃঃ ৭৬

৩. তদেব, পৃঃ ৭৯

৪. পাখিরাজ্যের এক নিষ্ঠুর রূপকথা, পৃঃ ১৬৬

৫. তরমুজ, পৃঃ ১৯

৬. তদেব, পৃঃ ১৯

৭. তদেব, পৃঃ ২১

৮. তদেব, পৃঃ ২২

৯. তদেব, পৃঃ ১২

১০. তদেব, পৃঃ ২২-২৩

১১. স্বপ্নের ঝামুর ঝুমুর, পৃঃ ২৭-২৮

১২. বাংলা গল্পে কাছাড়, তপোধীর ভট্টাচার্য, শিলচর, ১৯৭৩-৭৪

১৩. উদ্বাস্তু স্রোত ও পশ্চিম বাংলার জনজীবন, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৭১

১৪. হারানো দিন হারানো মানুষ, দ্বিতীয় বর্ষ, পৃঃ ২২৩

১৫. তৃতীয় ভুবনের রূপকথা, পৃঃ ৮৭

১৬. তদেব, পৃঃ ৮৯

১৭. শহিদনামা, পৃঃ ১১

১৮. তদেব, পৃঃ ১১

১৯. তদেব, পৃঃ ১৩

২০. তদেব, পৃঃ ১৪

২১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, পৃঃ ২০৭

২২. মানিক জিজ্ঞাসা পদ্মানদীর মাঝি, পৃঃ ২০৮

২৩. প্রতিরোধ কমিটি, পৃঃ ৬২

২৪. তদেব, পৃঃ ৭১

২৫. দধিয়া, পৃঃ ৬৫

২৬. তদেব, পৃঃ ৬৬

২৭. ওরা দুই দৌবারিক, পৃঃ ২২

২৮. তদেব, পৃঃ ২৪

২৯. তদেব, পৃঃ ৩১

৩০. তদেব, পৃঃ ৩৬

৩১. আপদ্ধর্ম, পৃঃ ৯৪

৩২. তদেব, পৃঃ ৯৬

৩৩. কথায় কথায়, পৃঃ ৯৮

৩৪. তদেব, পৃঃ ৯৬

৩৫. তদেব, পৃঃ ৯৮

৩৬. তদেব, পৃঃ ৯৯

৩৭. তদেব, পৃঃ ১০৪

৩৮. পাঠ-সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, পৃঃ ১৩৩-১৩৪